দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 FEB 2013
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতা

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। খাতাকলমে ইহা ৯৯.৪৭ শতাংশ। নিঃসন্দেহে ইহা আশাব্যঞ্জক। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীর হার এখনও উদ্বেগজনক। যদিও এই হার দিন দিন কমিতেছে, তথাপি হতাশার অনেক কারণ আছে। বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা কাটাইয়া উঠা যেন দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন নানা ধরনের আইন, বিধি ও উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ধরা দিতেছে না। শিক্ষা ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল ৪২ লক্ষ শিক্ষার্থী। ২০১২ সালে এইসব শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে গত বৎসর এই পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করে মোট ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৯০৩ জন। অর্থাৎ এই পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে প্রায় ১৬ লক্ষ শিক্ষার্থী হ্রাস পাইয়াছে।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভর্তি হওয়া শিশুদের ৩৯ দশমিক ৮০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার আগেই ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা মোট শিক্ষার্থীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। এই ঝরিয়া পড়া রোধ করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন— প্রাথমিক বিদ্যালয়হীন গ্রামে কমপক্ষে একটি বিদ্যালয় তৈরি, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুসহ পিছাইয়া পড়া শিশু ও পিছাইয়া পড়া এলাকাগুলির প্রতি নজর বাড়ানো ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ, উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ প্রভৃতি বিষয়ও নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এইসব নীতি খুবই ইতিবাচক। কিন্তু তাহার বাস্তবায়ন কতটা হইতেছে তাহাই বড় কথা।

সূত্র মতে, প্রায় ২০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাইতেছে না। তাহাদের অধিকাংশই প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রমজীবী শিশু এবং বস্তি, হাওর বা পাহাড়ি এলাকার শিশু। তাহাদের ব্যাপারে আলাদা করিয়া যত্নবান হইতে হইবে। ইহাছাড়া রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতেও অনেক শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িতেছে। কারণ শহরে থাকিলেও অনেক নিম্ন আয়ের অভিভাবক হয় শিক্ষার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, না হয় এই ক্ষেত্রে কঠিন বাস্তবতা কাজ করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করিবার কথা। এই কমিটি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত হাজির হইবার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া থাকে। কিন্তু কার্যত এই ধরনের কমিটি সর্বত্র আছে কিনা বা থাকিলেও এখন কতটা সক্রিয় আছে, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে কমিটির গণ্যমান্য সদস্যরা সময় দিতে পারেন না বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ঝরিয়া পড়া আরও কমাইতে হইলে এই বিষয়টিও উপেক্ষা করা যায় না।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আয়োজনসহ আমাদের অনেক সাফল্য রহিয়াছে। তবে ব্যর্থতাগুলিও কম নহে। ইহা যথাসম্ভব ক্রমান্বয়ে দূর করিতে হইবে। ইহার পর মাধ্যমিক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করা ও ইহা হইতে ঝরিয়া পড়ার হার কমাইবার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহার পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধির বিষয়টিকে সামনে নিয়া আসা প্রয়োজন। প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলে দৃশ্যত সকলেই সন্তুষ্ট। কেননা হাজার হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাইতেছে। কিন্তু তাহারাই যখন ভাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে ব্যর্থ হয়, তখন শিক্ষার মান নিয়া প্রশ্ন দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন আমাদের ইহা লইয়াও ভাবিতে হইবে বৈকি।